ইসলামের অপর পৃষ্ঠ ও হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)

(২)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

‘সিফ্ফীন’ ময়দানে এসে আলী (রাঃ) বিনা যুদ্ধে তাঁর খেলাফত স্বীকৃতি আদায়ের সকল প্রকার শেষ চেষ্টা করলেন। উসমান হত্যার বিচার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্যে প্রতিনিধিদল পাঠালেন, নিজেও মুয়াবিয়ার কাছে ব্যক্তিগত পত্র দিলেন। কিন্তু তাঁর এই কোমলমতি আচরণ তীক্ষ্ন বুদ্ধির মুয়াবিয়ার চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলোনা। মুয়াবিয়া জানেন আলী মিথ্যাবাদী, প্রতারক। বাসরায় আয়েশার বিরুদ্ধে জামাল যুদ্ধের সময়ে আলী প্রথমে হজরত তালহা ও হজরত যোবায়েরের প্রশংসা করে তাদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- ‘তালহা তুমি রাসুলের (দঃ) একজন বিশ্বস্ত সাহাবী, ইসলামের একজন সাহসী বীর সৈনিক। তুমি আর আমি নবীজীর পাশে থেকে অনেক যুদ্ধ করেছি। তুমি না’হলে নবীজীকে ওহুদের যুদ্ধে সাহাবী হজরত খালিদ বিন্ অলিদের (রাঃ) হাত থেকে রক্ষা করা মুশকিল হতো। উল্লেখ্য, মহাবীর খালিদ বিন্ অলিদ, ওহুদের যুদ্ধে মোহাম্মদের (দঃ) মাথায় তরবারী দিয়ে এমন আঘাত করেছিলেন যে, নবীজীর হ্যালমেট ভেদ করে মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগায় তাঁর দুটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। একপর্যায়ে আলী যখন বল্লেন- তোমরাতো সেচ্ছায় আমার খেলাফত মেনে নিয়েছিলে, তাহলে আজ কেন আমার বিরোধিতা করছো? তালহা ও যোবায়ের একবাক্যে চিৎকার করে বল্লেন- ‘আল্লাহ্র কসম, আমাদের মাথার ওপর তলোয়ার রেখে আলী স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছিলেন’। বাসরার জনগন বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে একদল লোক মদীনায় প্রেরণ করলো। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, আলী শুধু তালহা ও যোবায়েরকেই নয়, অনান্য নেতৃপর্যায়ের লোক যারা খেলাফতের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দী হতে পারেণ, সকলকেই জোর পুর্বক তাঁর খেলাফত মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন। মুয়াবিয়া এও জানেন, তালহা ও যোবায়েরের এতো প্রশংসাকারী আলীই তাদেরকে হত্যা করে আয়েশার দুই বোনকে একসাথে বিধবার কাপড় পরিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া মনেমনে ভাবলেন. আলী, আয়েশার বাসারা দেখেছো, মুয়াবিয়ার সিরিয়া দেখ নাই। আলীর প্রতিউত্তরে মুয়াবিয়া জানিয়ে দিলেন- ‘উসমান হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সোপর্দ না করা পর্যন্ত একটা সৈন্যও রণক্ষেত্র থেকে সরানো হবেনা’। এতক্ষণে হজরত আলী বুঝলেন এখানেই হবে হয়তো তার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই হয়তো সুচনা করবে ইসলামের ভিন্নমুখী এক নতুন ইতিহাস। মুয়াবিয়া জানেন, উসমান হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আলীর পক্ষে সম্ভব নয়। আলীও জানেন তার সেনাবাহিনীর বেশীরভাগ লোকই উসমান হত্যায় জড়িত। আলীর সেনাপতি মালিক আল্ আশতার ও মোহাম্মদ বিন্ আবু-বকর তাদের অন্যতম। উসমান হত্যাকারীদেরকে মুয়াবিয়ার হাতে সোপর্দ করা আর প্রকারান্তরে তাঁকে খলিফা মেনে নেয়ারই সমান।

৬৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস (জিলহাজ ৩৭ হিজরী) সৈন্য মোতায়েন, সংলাপ বিনিময়, ছোট ছোট খন্ডযুদ্ধে অতিবাহিত হলো। মে মাসে বিশাল প্রশস্ত সিফ্ফিন মাঠ, ইসলামের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সেনাদলের পদাঘাতে থরথর করে কেঁপে

উঠলো। বর্শা আর তরবারীর ঝন-ঝনানী শব্দে, রণ-বাদ্যের হুংকারে স্তব্ধ হয়ে যায় জগতের পশু-পক্ষী, জীব জন্তুর কলরব। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর ১২০ হাজার সৈন্যকে ৮জন সেনাপতি দিয়ে ৮টি দলে বিভক্ত করলেন। অপর পক্ষে আলীও তাই করলেন। যুদ্ধের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য, এই বিশাল আয়োজন দেখে উভয় পক্ষই আতঙ্কিত হলো, এই বুঝি ইসলাম ও মুসলিম জাতী বিশ্বের মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যায়। কেউই পুরোদমে (Full scale) যুদ্ধ শুরু করতে চাইলোনা। বিচ্ছিন্নভাবে সেক্টর ভিত্তিক যুদ্ধ চল্লো পুরো একমাস। আসলো জুন, ৩৭ হিজরীর পবিত্র মোহার্‌রম মাস। উভয় পক্ষই যুদ্ধ-বিরতি চাইলো। আলী পুনরায় সংলাপের মাধ্যমে বিষয়টার সমাধান চাইলেন। চতুর মুয়াবিয়া বিরতির সময়টাকে প্রপাগান্ডা ছড়ানোর কাজে লাগালেন। আলীর সৈন্যদলে যারা উসমান হত্যার বিচার কামনা করে, তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, আলী সত্যিকার অর্থে উসমান হত্যার বিচার করবেননা, কারণ হত্যাকারীরা আলীর আত্নীয়, আলী তাদেরকে চেনেও না-চেনার ভান করেণ। উসমান হত্যাকারীদেরকে গ্রেফতার করাতো দূরে থাক বরং অনেককে তিনি সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে পুরুস্কৃত করেছেন। আলীর কিছু লোক তাঁর ওপর সন্দেহ পোষন করতে শুরু করলো। উভয় পক্ষের সংলাপ চলতে থাকলো। এক পর্যায়ে সিরিয়ার সংলাপ প্রতিনিধিদল আলীকে প্রশ্ন করেন- 'আলী, আপনার দৃষ্টিতে খলীফা উসমানকে হত্যা করা কি ন্যায়-সঙ্গত ছিল'? আলী জবাব দেন- 'এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলবোনা'। মুয়াবিয়ার প্রপাগান্ডার বৃক্ষে ফল ধরতে শুরু করলো। আলীর সকল প্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তিনি দেখলেন এখান থেকে বিনা যুদ্ধে পরিত্রাণ পাওয়ার সকল পথ মুয়াবিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আরবী সফর মাসে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রতি দিন উভয় পক্ষে শতশত প্রাণহানি ঘটতে থাকলো। আলীর সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) একাই একদিনে, প্রতিবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে একএক করে ৪০০জন শত্রুর মস্তক কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুয়াবিয়ার একজন সৈন্য আলীর পেছনে ধাওয়া করে এসেছিল। আলী তলোয়ার দিয়ে তার পেট বরাবর এমন শক্ত কোপ মেরেছিলেন, চোখের পলকে লোকটির শরীরের নীচভাগ ঘোড়ার পিঠে রেখে উপরিভাগ মাটিতে পড়ে যায়। সুর্য্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত, সন্ধা থেকে ভোর পর্যন্ত বিরামহীন যুদ্ধ চল্লো। দিনে-দিনে প্রাণহানীর সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। তবে তুলনামুলক ভাবে মুয়াবিয়ার দিকে হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশী। আলীর সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন, বিজয় নিকটবর্তি। মুয়াবিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের কথা ভাবছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মুয়াবিয়ার সেনাপতি সাহাবী হজরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ) তাদের শ্রেষ্ট প্রতারণার অস্ত্রটি ব্যবহার করার অনুমতি চাইলেন। মুয়াবিয়ার অনুমতি নিয়ে হজরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ) তার সৈন্যবাহিনীর বর্শার ফলকে ৫০০ কপি কোরআন গেঁথে দিয়ে উড়াতে নির্দেশ দিলেন। আলীর সেনাবাহিনী থমকে গেল, বিষয়টা কি? আমর ইবনে আ'স বল্লেন- আর রক্তপাত নয়, উভয় পক্ষের অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়ে গেছেন। আমরা অস্ত্র নয়, কুরআনের মাধ্যমে ফয়সালা চাই। হজরত আলী তাঁর সিপাহীদেরকে নিষেধ করলেন- 'সাবধান মুয়াবিয়ার প্রতারণায় কর্ণপাত করোনা, এ নিসক প্রতারণা বই কিছু নয়'। বেশকিছু সৈন্য আলীর কথা অমান্য করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। আলীর সেনাপতি হজরত মালিক আশতার (রাঃ) দৌড়ে এসে বল্লেন- 'আল্লাহ্‌র কসম, আর কিছুক্ষণ সময় তোমরা দৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, বিজয় আমাদের অনিবার্য'। এক নাগাড়ে একমাস যুদ্ধ করে অবশ ক্লান্ত দেহের,

আলীর একদল সৈন্য হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বল্লো- ‘আমরা অস্ত্রের চেয়ে কুরআনের মাধ্যমে ফয়সালা শ্রেষ্ঠ মনে করি’। চতুর্দিক দিক থেকে ‘আল্লাহ্‌র আইন, কুরআনের ফয়সালা’ চিৎকার ধ্বনি শুনা গেল। আলী পুনরায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তার দলের কিছু লোক, এই বলে আলীর ওপর অভিযোগ আনলো যে, আলী ইচ্ছে করেই ক্ষমতার লোভে মুসলিম জাতীকে এ যুদ্ধে লিপ্ত করেছেন, এবং তিনি উসমান হত্যার বিচার মোটেই চাননা। আলীকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলো।

বনি-কিন্দা প্রধান হজরত আল্-আশা’ত, মুয়াবিয়াকে জিজ্ঞেস করেণ- ‘৫০০ খানি কোরআন বর্শার মাথায় গাঁথার মা’নেটা কি’? মুয়াবিয়া বল্লেন- ‘আল্লাহ্‌র ইচ্ছের ওপর, তাঁর কোরআনে লিখিত সমস্যার সমাধান খোঁজা আমাদের উচিৎ’। কোরআনকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেও মুয়াবিয়া কোরানিক সমাধানটা নিজেই দিয়ে দিলেন। বল্লেন- ‘ উভয় পক্ষ নিজনিজ দল থেকে একজনকে প্রধান করে মধ্যস্থতাকারী কমিটি গঠন করা হউক। মধ্যস্থতাকারী দুই প্রধান যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে’। আলীর লোকজন সমস্বরে বলে উঠলেন-‘আমরা মানি, আমরা মানি’। বৈঠক বসার আগে হজরত মুয়াবিয়া অতি গোপনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেল্লেন। হজরত উসমানের সময়ের মিশরের গভর্ণর হজরত আমরকে বল্লেন- ‘বৈঠকে সিদ্ধান্ত যা-ই হউক তুমি মিশর ছাড়বেনা’। আমর বল্লেন- ‘যদি মিশর আলীর দখলে চলে যায়’? সর্ব প্রথম মিশর আক্রমন করা হবে, তোমরা প্রস্তুত থেকো। মুয়াবিয়া হজরত আমরকে আশ্বস্ত করলেন। আলীর পক্ষে মধ্যস্থতাকারী দল-প্রধানও মুয়াবিয়ার তৈরী। আলী প্রস্তাব করলেন দল-প্রধান হিসেবে প্রবীন নেতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নাম। আলীর লোকেরা প্রতিবাদ করলো। তারা প্রস্তাব করলো মুয়াবিয়ার সমর্থক হজরত আবু-মুসার (রাঃ) নাম। আলী বল্লেন- ‘সর্বনাশ, আবু-মুসা একজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। তাকে আমি কুফার অস্থায়ী গভর্ণর করে পাঠিয়েছিলাম। সে আমার খেলাফত অস্বীকার করায় এই সেদিন আমি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি’।

আজ আলীর অন্ধসমর্থনকারী কুফাবাসীও আলীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। তারা বল্লো- ‘আলী তোমারই কারণে আয়েশার বিরুদ্ধে জামাল যুদ্ধে কুফার হাজার হাজার নারী বিধবা হয়ে কাঁদছে, তাদের চোখের জল আজও শুকায়নি’।

জীবনে কোন অস্ত্র-যুদ্ধে হজরত আলী পরাজিত হননি। আজ বিজয়ের দ্বার-প্রান্তে এসে এমন অসহায় পরিণতি আলীর প্রশস্থ বুকটিকে অশ্রুজলে সিক্ত করে দিল। পরাজিত নাহয়েও নিজেকে পরাজিত ভাবলেন। মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আস আর আলীর পক্ষে আবু-মুসা হলেন বিচারক। চিরপরিচিত দু’জন দুর্ধষ সন্ত্রাসী ডাকাত, দু’জন গণশত্রু। ভীত-সন্ত্রস্ত, সৃজনহারা সাধারণ মানুষ যেকোন শর্তেই হোক সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের অবসান চায়।

৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী (৩৭ হিজরীর রমজান মাস) ঐতিহাসিক ‘আলী-মুয়াবিয়া’ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

চলবে-